রামকৃষ্ণায়ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

আমাদের এক বন্ধু আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, ''তোমাদের হিন্দুধর্ম খুব দুর্বল। কারণ ভগবানকে বারবার অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করতে হয় তোমাদের ধর্মকে শক্তিশালী করবার জন্য। অথচ বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে একজনই অবতার রয়েছেন।'' আমি বললাম, ''দেখো, ভগবান স্বর্গে বসে বসে একঘেয়েমির জন্য ক্লান্ত হয়ে যান। তাই তিনি মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেখতে চান তাঁর সন্তানরা কে কীরকম আছে ও কী করছে। এখন প্রশ্ন হল : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? কোনও ধর্মে আছে—তাদের ধর্মের প্রবর্তক মাত্র একজন। ভবিষ্যতে আর কেউ হতেও পারবে না। খ্রিস্ট ধর্মে আছে—Christ is the only begotten son of God। ওইসব ধর্মে ভগবান জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। হয় তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ হবে নতুবা ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। তাই ভগবান কোথায় জন্ম নেবেন? তিনি ভারতবর্ষে যান এবং জন্ম নেন। আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তাই তিনি বারবার অবতাররূপে আমাদের কাছে আসেন। অধিকন্তু দেবদেবীরা ভারতে খুব নিরাপদ বোধ করেন।''

আমার এক জেসুইট অধ্যাপক বন্ধু ছিলেন। খুব বিদ্বান। একদিন অবতার প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বললেন, জাপানে একটি বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন (Canon) আছে : "If you see Buddha on the street–kill him." এর অর্থ হল বুদ্ধ কোনও ব্যক্তি নন—তিনি হলেন অনুভূতি। এখানে ব্যক্তিত্বলোপের ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর খ্রিস্টধর্মেরও একটা অনুশাসন আছে : "If you see Christ on the street, crucify him." এর অর্থ হল Christ তো already resurrected (পুনরুজ্জীবিত) হয়েছেন; সুতরাং তাঁর আর রূপ পরিগ্রহ সম্ভব নয়।

আমি বললুম, "If you see Ramakrishna on the street, have a nice time with him, He is full of fun and joy."

হিন্দুধর্ম খুবই জীবন্ত—Vibrant। কারণ বহু। এক, এত অধিক সংখ্যক দেবদেবী অন্য কোনও ধর্মে নেই। অপর প্রধান ধর্মগুলি একেশ্বরবাদী। কথায় বলে—হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবী—শিব, বিষ্ণু, গণেশ, কালী, তারা, দুর্গা ইত্যাদি। দুই, বহু অবতার। ভাগবতে অবতারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—''অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ

সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ১।৩।২৬—যেমন অক্ষয় সরোবর থেকে অসংখ্য পয়ঃপ্রণালী নির্গত হয়, সেরূপ সত্ত্বনিধি শ্রীহরি হতে সংখ্যাতীত অবতার নিঃসৃত হয়েছেন। অন্যান্য ধর্মে সংস্থাপক মাত্র একজন। তিন, হিন্দুধর্মের মতো এত মুনিঋষি, সাধুসন্ত, সিদ্ধপুরুষ, মরমিয়া সাধক অন্য কোনও ধর্মে নেই। পঞ্জিকা থেকে আমরা এঁদের আবির্ভাব ও তিরোভাব জানতে পারি। চার, পুণ্যতীর্থ ভারত। হিন্দুদের মতো এত তীর্থস্থান অন্য ধর্মে নেই। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, দ্বারকা থেকে কামাখ্যা—এই বিরাট আর্যাবর্ত তীর্থে ভরা। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, একান্ন শক্তিপীঠ, অবতারদের জন্মস্থান ও তাঁদের লীলাভূমি। দেবতাত্মা হিমালয় ও মন্দিরময় ভারত সৃষ্টি করেছে ভাবঘন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ। পাঁচ, ভারতের নদনদীকে আমরা দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করি। হিমালয় থেকে বেরিয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাদের বহু শাখা ও উপশাখা যারা সমগ্র উত্তর ভারতের প্রাণস্বরূপ। তেমনি নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী দক্ষিণ ভারতকে জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এসব নদীতটে গড়ে উঠেছে ভারতের প্রাচীন আর্যসভ্যতা ও ধর্ম। ছয়, হিন্দুধর্মের মতো এত শাস্ত্র, দেবদেবীর স্তুতি অন্য কোনও ধর্মে নেই। সাত, হিন্দুধর্মের মতো এত মঠ, আশ্রম, আখড়া, তপস্যাক্ষেত্র অন্য ধর্মে নেই। আট, কথায় বলে বারো মাসে তেরো পার্বণ। হিন্দুধর্মের মতো এত উৎসব, পালপার্বণ অন্য ধর্মে নেই। এসব উৎসব সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগায়। নয়, মেলা ও সাধু সম্মেলন হিন্দুধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগরের মেলা, জয়দেব মেলা, রথের মেলা, দোলযাত্রা প্রভৃতি হিন্দুদের ধর্মকে জীবন্ত করে রেখেছে। দশ, ভারতবর্ষ পৃথিবীর চারটি মহান ধর্মের জন্মস্থান—হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম। ভারত নামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভা=জ্যোতি, রত=মগ্ন। যে-দেশ আত্মজ্যোতিতে মগ্ন সেই দেশ ভারত।

অবতারের জন্ম

অবতার সাক্ষাৎ ভগবান—যিনি মানুষরূপে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন। মানুষ জন্মগ্রহণ করে কর্মের ফলে ও বাসনার বশে। ভগবানের তো কর্ম নেই, বাসনাও নেই। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ও সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজের মায়াকে অবলম্বন করে নামরূপের রাজ্যে প্রবেশ করেন। নিজের কোনও প্রয়োজন নেই, তবুও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করে তিনি অবতারত্ব স্বীকার করেন। গীতায় তিনটি কারণ দেখানো হয়েছে—সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত-বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ অবতার ব্যতীত নিষ্পন্ন হতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্ম সংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্য অবতার স্বীকার করে ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

বিষ্ণুপুরাণে আছে : ''স্বধর্মকর্মবিমুখাঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বাদিনঃ।/ তে হরের্দ্বেষিণো মূঢ়া ধর্মার্থং জন্ময়তে হরিঃ॥''—যারা নিজেদের করণীয় ধর্মেকর্মে বিমুখ, কেবল মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে, সেইসব মূঢ় ব্যক্তিরা সত্যসত্যই ভগবানের শত্রু। কেননা মনুষ্য করণীয় ধর্মসাধন করবার জন্যই শ্রীভগবানকে জন্মগ্রহণের ক্লেশ ভোগ করতে হয়।

এ-পৃথিবীতে আদর্শ পুরুষ কে আছেন? বাল্মীকি এটি জানার জন্য নারদকে প্রশ্ন করেন : ''সম্প্রতি এই লোকে গুণবান কে? বীর্যবান কে? ধর্মজ্ঞ কে? কৃতজ্ঞ কে? সত্যবাদী কে? দৃঢ়ব্রত কে? চরিত্রবান কে? সর্বপ্রাণীর হিতকারী কে? বিদ্বান কে? সমর্থ

কে? প্রিয়দর্শন কে? আত্মবান কে? ক্রোধজয়ী কে? দ্যুতিমান কে? অসূয়াশূন্য কে? রণকর্কশ মূর্তি দ্বারা দেবতারও ভয়কারী পুরুষ কে আছেন?"

উত্তরে নারদ বলেন : ''ইক্ষ্বাকুবংশজাত রামচন্দ্রই সেই আদর্শ পুরুষ। তিনি গাম্ভীর্যে সমুদ্র, ধৈর্যে হিমালয়, বীর্যে বিষ্ণুতুল্য, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, ক্রোধে কালাগ্নিতুল্য, ক্ষমায় পৃথিবীসমান, ত্যাগে কুবেরের অনুরূপ, সাক্ষাৎ মূর্তিমান ধর্ম।"[১] যুগপ্রয়োজনে অবতাররা জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র সত্যধর্ম, কৃষ্ণ সনাতন ধর্ম, বুদ্ধ অহিংসা ধর্ম, খ্রিস্ট প্রেমধর্ম, রামকৃষ্ণ 'যত মত তত পথ'-রূপ সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান যুগ বহু জটিল সমস্যার মধ্য দিয়ে চলেছে। তাই যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের কতকগুলি বিশেষ অবদান আমরা দেখতে পাই, যেমন ধর্মকে তিনি জটিল বন্ধন থেকে সরল করেছেন; সংশয়রূপ রাক্ষসকে নাশ করে মানুষের মনে বিশ্বাস এনেছেন, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-রাজযোগের সমন্বয় করেছেন; সর্বধর্মের সমন্বয় করেছেন; দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের মিলন ঘটিয়েছেন। তারপর নিজের স্বরূপ শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করে বলেছেন : ''যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।"

সব ধর্মেই অবতার বা সেই ধর্মের প্রবর্তকদের জন্মদিন পালিত হয়। রামের জন্ম রামনবমীতে, কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে, বুদ্ধের বুদ্ধপূর্ণিমায়, শ্রীচৈতন্যের দোলপূর্ণিমায়,—এছাড়া মহাবীর জয়ন্তী, নানকজয়ন্তী, শংকরজয়ন্তী প্রভৃতি মহাসমারোহে পালিত হয়। পাশ্চাত্যে দেখি আজকাল অধিকাংশ মানুষ চার্চে যায় না। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে। এর দ্বারা একটা জমাট আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অগণিত মানুষ তাঁর জন্মোৎসব পালন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ফাল্গুনী শুক্লদ্বিতীয়া, বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ, সূর্যোদয়ের ১২ মিনিট পূর্বে। স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে তিনি ঠাকুরের কাছে শুনেছেন : ''তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করানো হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। তাঁহার জন্ম ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়াছিল, ওইদিন বুধবার ছিল। তাঁহার কুম্ভরাশি এবং তাঁহার জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ ছিল।"[২] সত্যান্বেষী সারদানন্দ ঠাকুরের কথার সূত্র ধরে, পুরনো পঞ্জিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শশিভূষণ ভট্টাচার্য, নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ প্রমুখের দ্বারা ঠাকুরের একটি বিশুদ্ধ কোষ্ঠী তৈরি করান। এটি এখন বেলুড় মঠের archives-এ রক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম খুব গরিবের ঘরে। ওইকালে কামারপুকুরে কারও বাড়িতে ঘড়ি ছিল কি না সন্দেহ। লোকেরা সূর্য দেখে সময় নিরূপণ করত। লীলাপ্রসঙ্গ লেখার সময়ে সারদানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাপ, মা, ভাইবোনের জন্মসাল ঠিক করতে মহা মুশকিলের মধ্যে পড়তে হয়েছে। অনেক গবেষণা করে এবং কিছু আন্দাজের উপর তিনি তাঁদের জন্মসাল ঠিক করেছেন। ১৮৩৬ থেকে ১৮৮০ সাল—এই দীর্ঘ ৪৫ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও জন্মোৎসব পালিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই শেষ ছয় বছর তাঁর শিষ্য ও ভক্তেরা তাঁর জন্মোৎসব পালন করেছেন। প্রশ্ন জাগে প্রচারবিমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কেন জন্মোৎসব পালনের অনুমতি দিলেন? মনে হয় তিনি চাইছিলেন—প্রথম, ভক্তগোষ্ঠী তৈরি করতে ও তাদের মনে আনন্দ দিতে। দ্বিতীয়, জাতিভেদপ্রথা ভাঙতে। তিনি

বলতেন, ''ভক্তের জাত নেই।'' তৃতীয়, ধনী-দরিদ্র, ভক্ত-ভিখারি, নারী-পুরুষ প্রভৃতির ভেদ ঘুচাতে। উৎসবকালে সব একাকার হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জন্মোৎসবের জন্মতিথি ছিল বুধবার, ২ মার্চ ১৮৮১ এবং দ্বিতীয় বর্ষের জন্মতিথি ছিল রবিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ। ওই দুই বর্ষের একই দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি ও জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। লাটু মহারাজের বিবরণ থেকে জানা যায়, ঠাকুর প্রথমে কোনও উৎসাহ দেখাননি, কিন্তু পরে ভক্তদের অনুরোধে রাজি হন। লাটু মহারাজ বলেন, ''এ উৎসব রাম দত্ত, সুরেশ মিত্র দ্বারা তিনি থাকতেই করিয়েছিলেন। সব ভক্তেরা রবিবারে গিয়েছিলেন। তিনি অবতারের বিষয়, তিথি, জন্মবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। ভক্তেরা সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার জন্মতিথি কবে? ঠাকুর ধমকে বললেন—তা শুনে কি হবে? তারপর বললেন—ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। আর বললেন—যার জন্মতিথি তাকে সেই দিন ভাল কাপড় পরাতে হয়, ভাল জিনিস খাওয়াতে হয়, পুকুরে ল্যাটা মাছ ছেড়ে দিতে হয়। ঐ দিনে মাছ-মাংস খেতে নেই। রাম দত্ত, সুরেশ মিত্তির বললেন—আমরাও উৎসব করবো। তখন দেড় শত দু'শত লোক হতো। ভাল কীর্তন, গান-বাজনা, পদাবলী হতো। যা জিনিস বাঁচত, গরিবদের দেওয়া হতো।''[৩]

প্রথম দুই বর্ষের ব্যয়ভার সুরেন্দ্র মিত্র বহন করেন। তিনিই ছিলেন প্রস্তাবকর্তা ও উদ্যোক্তা এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দেন বলরাম বসু, রাম দত্ত, মনোমোহন মিত্র, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরীশ মুস্তাফি প্রভৃতি। অনুমান হয় সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র লাটু মহারাজ দুটি জন্মোৎসবেই যোগ দিতে পেরেছিলেন। একশো চল্লিশ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত এই দুই জন্মোৎসবের বিবরণ আমরা প্রত্যক্ষদর্শী মনোমোহন ও রাম দত্তের নিকট থেকে চোখ বুজে শুনব ও মনশ্চক্ষে দেখব।

মনোমোহন লিখেছেন, ''আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছি, তাহার কয়েক মাস পরে আমাদের পরমাত্মীয় অটুট বিশ্বাসী স্পষ্ট বক্তা মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিমান গিরীন্দ্রনাথ মিত্র আমাদের সহিত যোগদান করিলেন। আমরা তাঁহাদিগকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দলাভ করিলাম। মহাত্মা সুরেন্দ্রনাথের যত্নে এবং ব্যয়ে ১৮৮১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সংস্থাপিত হয়। আমরা সেই দিবস কয়েকটী মাত্র বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করি। পরম তেজস্বী ভক্ত মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত তখন নিম্নলিখিত গানটি ধরিলেন—

'সুরধুনী তীরে হরি বলে কেরে!
প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। (বুঝি)
(তা নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।)
(নিতাই নৈলে) (দয়াল নৈলে)'

সিংহের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব গর্জন করিয়া উঠিলেন। ভাবে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, সিংহ বিক্রমের মধ্যে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ক্ষণে জ্ঞান এবং অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, দরদরিত প্রেমাশ্রু দুই গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। আমরাও আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলাম, কলের পুত্তলিকার ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তালে তালে নাচিতে লাগিলাম। হরিনামের জয়ধ্বনিতে দিক্‌সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণের উৎসাহসূচক ভাব কোটীগুণ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেহ উর্দ্ধবাহু [ঊর্ধ্ববাহু] হইয়া, কেহ করতালি দিয়া, কেহ লম্ফে ঝম্পে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ ভাবে প্রেমে বিগলিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন, কেহ মাতোয়ারা

হইয়া হাসিতে হাসিতে অন্য ভক্তের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ উচ্চ ক্রন্দন করিয়া পরক্ষণেই অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন, এমন হাসি আমরা কখনও দেখি নাই, প্রলয়ের জল স্রোতের ন্যায় প্রবাহ হইতে লাগিল। সকলেই পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, ক্রমে সংকীর্ত্তনের বিরাম হইল।

''সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর যখন নিম্নলিখিত গানটী হইল—

'নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে,
আপনার বলিবার॥
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল
সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল,
আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥
তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ
তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু
অনন্ত সুখের আধার॥...'

''তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহির্জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছাড়িয়া চিদাকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তিনি জড়বৎ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরনেত্রে বসিয়া রহিলেন, মুখমণ্ডল আনন্দপূর্ণ, এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিতে আলোকিত হইল, আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। সেদিনকার ছবি অদ্যাপিও আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে।''[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় জন্মোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ রাম দত্ত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকার দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয় :

''অদ্য ঠাকুরের জন্মদিন। ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, শুক্লপক্ষ রবিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ। বেলা আট ঘটিকার সময় হইতে ভক্তগণের দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আগমন হয়। নয়টার সময় কেদারবাবু, নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত তথায় পৌঁছেন। ঠাকুর তৎকালে একটি বারান্দায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। কেদারবাবু উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর এককালে স্থির সমাধিতে চলিয়া গেলেন। সকলে মিলিয়া কীর্তন করিলেন কিন্তু কিছুতেই সমাধি ভঙ্গ হইল না। এমন সময় একজন পশ্চিমাঞ্চলের যোগী আসিয়া তাঁহাকে দুই-একবার নাড়াচাড়া করিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহা জানিতেও পারিলেন না। যোগীকে ওরূপ অঙ্গ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইল। অনন্তর নরেন্দ্রকে 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন' এই গীতটি গান করিতে অনুরোধ করা হইল। এই গানে ঠাকুরের সংজ্ঞা হইল—তিনিও গান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আরও কয়েকটি গান হইল। ক্রমে সেই স্থানে ২৪।২৫টি ভক্ত আসিয়া পৌঁছিলেন, বেলা তখন প্রায় ১১টা হইবে। উপদেশের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, সংসারে জীব আহারের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে হানি নাই, কিন্তু মনটা যেন সেই পরমাত্মায় থাকে, যেমন বালকরা যখন খুঁটি ধরিয়া ঘুরিয়া থাকে তখন সে অন্যান্য বালকের সহিত কত প্রকার রঙ্গভঙ্গ করিয়া থাকে কিন্তু বাস্তবিক তাহার মন কোথায়? তাহার মন সেই খুঁটিতে আছে, খুঁটি ভুলিয়া যাইলে হাত পিছলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

''বেলা দুই প্রহরের সময় অনুমান ৫০।৬০ জন ভক্ত মিলিয়া ঠাকুর পঞ্চবটী নামক স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। পঞ্চবটী—এই স্থানে ঠাকুর যোগসাধন করিয়াছিলেন। পূর্বে এইস্থানে একখানি পর্ণকুটির ছিল এবং তাহার সম্মুখে বট, আমলকী, নিম্ব, বিল্ব ও অশ্বত্থ গাছ ছিল। বট বৃক্ষটি মাধবী ও মালতী লতিকা বেষ্টিত। এই বটবৃক্ষ অতিশয় পুরনো, ইহার গোড়াটি ইষ্টকাদি দ্বারা বাঁধানো এবং এক পাশে সিঁড়ি আছে। এইস্থানে সূর্যকিরণ একেবারে যাইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অতএব সেই বৃক্ষশাখাই চন্দ্রাতপের কার্য করিয়াছিল।

''সেই স্থানে কেবল সংকীর্তন হইয়াছিল। এই সংকীর্তন বেলা চারি ঘটিকা পর্যন্ত হয়। ইহার মধ্যে এক ঘণ্টা ঠাকুর অনুপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর সেই সংকীর্তনের মধ্যস্থলে ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। এমন অদ্ভুত নৃত্য কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। প্রেমের লহরী চলিয়াছিল, সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময় যেমন উল্লেখিত আছে—সঙ্কীর্তনে প্রেমের প্রবাহ চলিত, ভক্তগণ সেই শোনা কথা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলেন—ভক্তরা মনে করিলেন, মরি মরি কি শুভদিন আজ পোহাইয়াছিল। ভক্তবৎসল হরি, আজ কি পাপীদের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য দিয়া প্রেম ঢালিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাল করিয়া দিলেন। ধন্য আমরা বঙ্গবাসী, এই ঘোর কলিকাল—যে সময়ে ধর্মের এতদূর অধোগতি, ধর্মের ভান করিয়া যে সময়ে লোকে কেবল নিরয়পথ পরিষ্কার করিতেছে, ভক্তি প্রেম মর্তলোক পরিত্যাগ করিয়াছে—এমন সময় যে আবার বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিতে বঙ্গবাসীদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে তাহা কাহারও মনে ছিল না। এইরূপ বোধ করি সকলের অভিপ্রায় হইয়াছিল—কেন না সেই সময়ে এই গীতটি সকলে উন্মত্ততার সহিত গান করিয়াছিলেন :

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—
ও তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে,
নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে।

''পরে 'এই আমাদের প্রেমদাতা' এই ধুয়া ধরিয়া অর্ধ ঘণ্টা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। ঠাকুর তখন একেবারে স্থির সমাধিতে ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন। এই সময়ের ভাব লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যখন সকলে এই ভাবে নিমগ্ন, এমন সময়ে কয়েকটি ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই সরল ও কোমল, প্রেমের স্রোতে তাঁহারা অভিভূত হইয়া অনিমেষলোচনে ঠাকুরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখাকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হইল যে, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। পুরুষেরাও তদ্রূপ কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন নিকটে আসিয়া কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ও ব্যক্তির (ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া) কি মরিবার পূর্ব লক্ষণ?

''সে বলিল, ঈশ্বরের নামে ভাব হইয়াছে।

''এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিয়ৎকাল (বোধ হয় অর্ধ ঘণ্টা) অবাক হইয়া থাকিয়া কখন চলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা দেখি নাই। সঙ্কীর্তনে নিত্যগোপালও সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের সঙ্গে তাহারও সমাধি ভঙ্গ হইল।

''বেলা অপরাহ্নপ্রায় দেখিয়া ঠাকুর রামকে আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। পরে সাড়ে চারটার সময় ঠাকুর, ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থগণ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যাহারা উপস্থিত ছিলেন সকলে প্রীতি-ভোজন করিলেন। ভোজনও অতি তৃপ্তিকর হইয়াছিল। অনুমান আশিজন ব্যক্তি ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার ব্যয় সুরেন্দ্রবাবু সহ্য করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে সকলে কেহ শকটারোহণে এবং কেহ নৌকা পথে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন।'' *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

১। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *অবতারতত্ত্ব*, ১৩৩৫, পৃঃ ৪
২। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৩৭২), ভাগ ১, পৃঃ ৭৭-৭৮
৩। স্বামী সিদ্ধানন্দ, *সৎকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭১), পৃঃ ৭-৮
৪। প্রবন্ধ 'ভক্ত মনোমোহন', *উদ্বোধন পত্রিকা*, ১৩৫১, পৃঃ ৮০-৮২